নীরব সাক্ষী বিশ্ববিদ্যালয়ের বধ্যভূমি

ইয়াসির আরাফাত সুজন
২৮ মার্চ ২০২৬, ১২:০০ এএম

বধ্যভূমি শব্দটি উচ্চারণ করলেই ভেসে ওঠে রক্তাক্ত এক ইতিহাস, নির্যাতনের নির্মম স্মৃতি এবং আত্মত্যাগের অমলিন কাহিনি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা এসব বধ্যভূমি আজও সাক্ষ্য দেয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার। তৎকালীন বেশকিছু বিশ^বিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল নিরীহ মানুষ, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ নাগরিকদের। সেসব বিশ^বিদ্যালয়ের বধ্যভূমি নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন ইয়াসির আরাফাত সুজন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের সব আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খান এবং রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টো বাঙালির স্বাধীনতার দাবি দমন করার প্রয়াসে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে গণহত্যার পরিকল্পনা করে, যা ২৫ মার্চ রাতে বাস্তবায়ন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল ১৮নং পাঞ্জাব, ২২নং বেলুচ, ৩২নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এবং কিছু সহযোগী ব্যাটালিয়ন। এই বাহিনীগুলোর অস্ত্রসম্ভারের মাঝে ছিল ট্যাংক, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, রকেট নিক্ষেপক, ভারী মর্টার, হালকা মেশিনগান ইত্যাদি। এসব অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে অগ্রসর হয়। ইউনিট নং ৪১ পূর্বদিক থেকে, ইউনিট নং ৮৮ দক্ষিণ দিক থেকে এবং ইউনিট নং ২৬ উত্তর দিকে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘিরে ফেলে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা করে ও প্রথম পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষককে হত্যা করা হয়। এই নৃশংস অভিযানের প্রধান লক্ষ্যগুলোর একটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেদিন রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, বিশেষ করে জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলে নিরস্ত্র ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালানো হয়। অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে তাদের লাশ গোপনে মাটিচাপা দেওয়া হয়, যা পরে বধ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই বধ্যভূমি কেবল একটি স্থান নয়- এটি জাতির আত্মত্যাগের প্রতীক। এখানে শহীদ হওয়া শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিচিহ্ন আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসকে জীবন্ত করে রাখে।

মিরপুর বাঙলা কলেজ

বাংলাদেশ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ আনুষ্ঠানিক বিজয় লাভ করলেও ঢাকার মিরপুর হানাদারমুক্ত হয় সবচেয়ে দেরিতে- ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ -এ। মিরপুর এলাকা বিহারি অধ্যুষিত হওয়ায় এখানে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপকতাও ছিল বেশি। মিরপুর ছিল

মুক্তিযুদ্ধের শেষ রণক্ষেত্র। বাঙলা কলেজ বধ্যভূমি শুধু মিরপুরেই নয়, বাংলাদেশের অন্যতম একটি বধ্যভূমি। কলেজের বড় গেট ও শহীদ মিনারের মাঝামাঝি জায়গায় ১৯৭১ সালে ছিল একটি পুকুর। এই পুকুর পাড়ে মুক্তিকামী বাঙালিদের লাইন করে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হতো। মিরপুরে বুদ্ধিজীবীদেরও হত্যা করা হয়েছিল।

কলেজের বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের দাবিতে ২০০৭ সাল থেকে আন্দোলন শুরু করে তৎকালীন শিক্ষার্থীরা।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ফটকের কাছে ব্রহ্মপুত্র নদের কোল ঘেঁষে নির্মাণ করা বধ্যভূমির স্মৃতিস্তম্ভ। মুক্তিযুদ্ধের সময় ইপিআর ক্যাম্পের অস্ত্র ব্যবহার করে ময়মনসিংহ জিলা স্কুল মাঠে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পাকবাহিনী ময়মনসিংহ শহরে শুরু করে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মুক্তিকামী মানুষদের ধরে এনে বাকৃবির পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নির্মমভাবে হত্যা করত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেখানে পাওয়া যায় তাদের কঙ্কালাবশেষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়েরিতে একজন শিক্ষকসহ ১৮ জন পরিচিত শহীদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাদের স্মৃতিকে ধরে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি হলের নামকরণ করা হয়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

গল্লামারী বধ্যভূমি খুলনা জেলার অন্তর্গত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই অবস্থিত ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে খুলনা অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বধ্যভূমি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রেডিও স্টেশন (গল্লামারী রেডিও সেন্টার) ভবনে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী মানুষদের ধরে এনে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করে গল্লামারী নদীতে ফেলে দেওয়া হতো। শহরের দুই কিলোমিটার অভ্যন্তরে গল্লামারী খালের পাশে এই বধ্যভূমির অবস্থান। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থানেই ছিল রেডিও পাকিস্তানের

খুলনা শাখা। এই বধ্যভূমিকে ঘিরে গড়ে ওঠে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। গণহত্যা ও নির্যাতন কেন্দ্র বেতার ভবন হয়ে ওঠে বিশবিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবন। মূলত রাজাকার ও শান্তি কমিটির সহযোগিতায় এসব হত্যাকাণ্ড হতো।

ফেনী সরকারি কলেজ

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ফেনী সরকারি কলেজ মাঠকে গণহত্যা ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। বর্তমানে ফেনী সরকারি কলেজ মাঠের দক্ষিণ দিকে ১.৫ একর জায়গায় স্মৃতিসৌধটি অবস্থিত। স্মৃতিসৌধের দুই পাশে গোলপোস্টের মতো দুটি উঁচু দেয়াল রয়েছে, যা 'নীরব বেষ্টনী' হিসেবে প্রতীকায়ন করে। যুদ্ধকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনী কলেজ মাঠের গোলপোস্টে ঝুলিয়ে নির্যাতন ও হত্যা করত, এই দেয়ালটি তার প্রতীকায়ন। স্মৃতিসৌধের পেছনের দেয়ালটি বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়াকে নির্দেশ করে। ওপর থেকে ঝুলন্ত ছয়টি সিলিন্ডার আকৃতির কাঠামো অমর শহীদের চেতনা, জাগরণ, সংগ্রাম, বেদনা, জয়, স্বাধীনতা গৌরবকে নির্দেশ করে। নিচ দিয়ে প্রবাহিত লালরঙের ধারা স্বাধীনতা যুদ্ধের রক্তপ্রবাহকে ইঙ্গিত করে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের এক নীরব সাক্ষী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বধ্যভূমি স্মৃতিস্তম্ভ'। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ একটি নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের স্থানে পরিণত হয়েছিল। নিরপরাধ শিক্ষক, ছাত্র ও সাধারণ মানুষকে এখানে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আজও এই বধ্যভূমি নাম না জানা অসংখ্য শহীদের আত্মত্যাগের সাক্ষী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শহীদ শামসুজ্জোহা হল থেকে পূর্বদিকে তাকালে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে ইট দিয়ে তৈরি একটি লাল স্তম্ভ দেখা যায়। এটিই মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার স্মৃতি বহনকারী 'বধ্যভূমি স্মৃতিস্তম্ভ'। এটি একটি গোলাকৃতি কূপের মধ্যে ৪২ ফুট উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যার চারপাশে কংক্রিটের বেদি ও

ফুলগাছঘেরা সিঁড়ি রয়েছে। স্তম্ভের গায়ের কালো ছাপ দেশের স্বাধীনতায় অবদান রাখা শহীদদের রক্ত শুকানো দাগের প্রতীক। অন্যদিকে কূপটিকে 'মৃত্যুকূপ'-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শামসুজ্জোহা হলকে ৯ মাস ক্যান্টনমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করেছিল পাকিস্তানি হানাদাররা। হলের করিডর ও কক্ষে হাত-পা বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে বেধড়ক পেটানো হতো মুক্তিপিপাসু বাঙালিদের। হলের পেছনে দীর্ঘ এক বর্গমাইল এলাকাজুড়ে রয়েছে এই বধ্যভূমি। অমানবিক ও পাশবিক নির্যাতন শেষে নিরপরাধ মানুষদের কখনও জীবিত, কখনও মৃত অবস্থায় গণকবর দেওয়া হয়েছিল এই এলাকাজুড়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একে একে সন্ধান মিলতে থাকে এই গণকবর বা বধ্যভূমির।